সভ্যতা ও আধুনিকায়ন

আলী শরীয়তি

কে সভ্য আর কে আধুনিকায়িত (modernized)? এই প্রশ্নের আলাপ ইসলামী মতবাদের আলোকে ভালোভাবে করা যেতে পারে। বিশেষ করে ইসলামী সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ যাদের উপর উম্মাহর নেতৃত্ব ও দায়িত্বের ভার অর্পিত তাদেরকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্নের পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরোপিত আধুনিকায়ন ও প্রকৃত সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সভ্যতার ছদ্মবেশে আমাদের মত নন-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠিগুলোর উপর আধুনিকতাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী আলাপের পূর্বে কিছু প্রত্যয়ের (Term) সংজ্ঞায়ন জরুরিঃ

১। বুদ্ধিজীবী (intellectual): একজন বুদ্ধিজীবী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক স্থান ও কালপর্বে তার “মানবিক মর্যাদা” (humanistic status) সম্পর্কে সচেতন। তার এই আত্মসচেতনতা তার উপর একটি দায়িত্বের ভার অর্পণ করে। তিনি দায়িত্ববান ও আত্মসচেতন হয়ে বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন। (আরো দেখুন ড. আলী শরীয়তি রচিত “From where shall we begin” এবং “The Intelectual and his responsibility”)

২। আত্মীকরন (assimilation): আত্মীকরন বলতে ব্যক্তির এমন ধরনের কর্মকাণ্ডকে বুঝায় যার মাধ্যমে সে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য একজনের আচার-আচরণকে অনুকরন করতে শুরু করে। এই ধরনের দুর্বলতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি তার নিজস্ব অতীত, জাতীয় চরিত্র ও সংস্কৃতিকে ভুলে যায়। অথবা যদি সে এই বিষয়গুলো মনেও রাখে, সে এগুলোকে স্মরণ করে ঘৃনা ও অবজ্ঞার সাথে। কোন রাখঢাক ছাড়াই আত্মপরিচয় রূপান্তরের স্বার্থে সে নিজেকেও অস্বীকার করে। যে উচ্চভাব ও স্বাতন্ত্র্য সে অপরের মাঝে খুঁজে পায় তা অর্জন করার আশায়, একজন অনুকারক (assimilator) তার প্রকৃত সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে তার লজ্জাজনক সংযুক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়।

৩। বিচ্ছিন্নতা (alienation): কোন ব্যক্তির আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া বা নিজের সাথে অপরিচিত হয়ে উঠা কিংবা নিজের প্রতি উদাসীন হয়ে উঠার প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নতা বলে। অর্থাৎ এর ফলে একজন ব্যক্তি আত্মপরিচয় হারিয়ে অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিজস্ব মতামত গঠন করে।

তাহলে “সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা” বলতে কী বোঝায়? আমরা জানি বিচ্ছিন্নতা হলো এমন একটি অবস্থা যখন ব্যক্তি তার নিজেকে সে যেমন তেমনভাবে না দেখে তার স্থলে অন্য কোন কিছু কল্পনা করে। সংস্কৃতি কী? যে ভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, সংস্কৃতি হলো একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক, অবস্তুগত শৈল্পিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ধর্মীয় ও আবেগীয় প্রকাশের (যেমন- প্রতীক, ঐতিহ্য, প্রথা) সমষ্টি যা ঐতিহাসিক পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে।

যখন আমি নিজের ধর্ম, সাহিত্য, আবেগ, প্রয়োজন এবং বেদনাকে নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে অনুভব করি, তখন আমি আপন সত্ত্বাকে অনুভব করি। এটি হলো সেই সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্ত্বা যা থেকে সংস্কৃতি উৎসরিত হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভিন্ন একটি সমাজ, ভিন্ন একটি অতীত ও ভিন্ন একটি চেতনা থেকে উৎসারিত কিছু সন্দেহজনক কৃত্রিম অনুঘটক

ধীরে ধীরে একটি সমাজে প্রবেশ করে। এই কৃত্রিম অনুঘটকসমূহ প্রকৃত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তার স্থলে এমন একটি মিথ্যা সংস্কৃতি আরোপ করে যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন একটি পরিস্থিতি, ভিন্ন একটি ঐতিহাসিক পর্যায় এবং ভিন্ন একটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর জন্যে প্রযোজ্য।

ফলে যখন আমি আমার আপন সত্ত্বাকে অনুভব করতে চাই, আমি নিজস্ব সংস্কৃতির স্থলে আরেকটি সমাজের সংস্কৃতিকে কল্পনা করি এবং এমন কিছু সংকট নিয়ে বিলাপ করি যেগুলো আদতে আমার নয়। আমি এমন কিছু আকাঙ্খা, আদর্শ ও বেদনা লালন করি যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন পরিস্থিতির অপর একটি সমাজের। নিজ সত্ত্বা সম্পর্কিত আমার ধারনা তখন আমি বাস্তবিকভাবে যেমন তেমনটি না হয়ে অপর (they) যেমন তেমনরূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ আমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা (alienation) জন্ম নেয়। এটা কি হাস্যকর নয় যে চরম দরিদ্র্যতা-উপবাস ও সমজাতীয় সাধারণ অনুভূতির একটি সমাজে আমেরিকান, ইংরেজ অথবা ফরাসি নাগরিকদের মতো আকাঙ্খা ও আচরণ বিরাজ করবে।

এভাবে নন-ইউরোপীয় সমাজগুলো ইউরোপীয় সমাজ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের বুদ্ধিজীবীরা আর প্রাচ্যভুক্ত থাকে না। একজন প্রাচ্যের মানুষের মতো তারা আর্তনাদ করে না কিংবা প্রাচ্যের জনগণ হওয়ার আকাঙ্খাও লালন করে না। একজন বুদ্ধিজীবী তখন আর তার নিজস্ব সামাজিক সংকট দ্বারা তাড়িত হয় না। বরঞ্চ পুঁজিবাদী ও বস্তুবাদী সাফল্য ও ভোগের সর্বশেষ ধাপে অবস্থানকারী একজন ইউরোপীয় ব্যক্তির বেদনা, কষ্ট, অনুভূতি ও প্রয়োজনকে সে নিজের বলে কল্পনা করে। এভাবে আজকে নন-ইউরোপীয় দেশগুলোতে বেদনাদায়ক এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নন-ইউরোপীয়রা এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলার শিকার হচ্ছে যাদের স্বতন্ত্র একটি স্বরুপ থাকার পরেও তারা তা অস্বীকার করছে। তাদের মনোজগতে এমন কিছু বিরাজ করে যা তাদের নিজস্ব নয়। তারা অপরকে কল্পনা করে এবং অন্ধভাবে তাকে অনুকরণ করে।

এই নন-ইউরোপীয় দেশগুলো ধরা যাক ২০০ বছর পূর্বে হয়তোবা আজকের পশ্চিমা সভ্যতার মতো ছিলো না, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী একটি সভ্যতা ছিলো। উদাহরণসরূপ ধরুণ আমি যদি ভারত অথবা আফ্রিকার কোন দেশে যেতাম আমি জানতাম যে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র রুচি ও কাঠামো রয়েছে। তারা তাদের নিজস্ব কবিতা রচনা করেছে যা ছিলো তাদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের জীবনের সাথেও সম্পৃক্ত। তাদের নিজস্ব সামাজিক রীতি ও ধর্ম ছিলো। তাদের যা কিছু ছিলো সবকিছুই ছিলো তাদের নিজস্ব। হয়তোবা তারা দরিদ্র ছিলো কিন্তু তারা রুগ্ন ছিলো না। দরিদ্র্যতা ও রুগ্নতা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

কিন্তু আজকে পাশ্চাত্য সমাজ তার দর্শন, চিন্তা-প্রক্রিয়া, তার আকাঙ্খা, তার আদর্শ, তার রুচি ও রীতি নন-ইউরোপীয় দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে তারা এই দেশগুলোর উপর তাদের সভ্যতার প্রতীক (প্রযুক্তি উদ্ভাবন) সমূহ চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে দেশসমূহ কেবল নতুন পণ্য ও গ্যাজেটের ভোক্তা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দেশগুলো কখনোই ইউরোপীয় রীতি, আকাঙ্খা, রুচি ও চিন্তা-প্রক্রিয়ার সাথে মিলিয়ে নিতে পারবে না।

> আমরা ভিন্ন ভিন্ন অংশ জোড়াতালি লাগিয়ে একটি আধুনিক কিন্তু কাঠামোবিহীন সমাজ নির্মাণ করছি যার কোন লক্ষ্য কিংবা উদ্দেশ্য নেই। দিনশেষে আমরা এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস পাচ্ছি যেখানে সবকিছু থেকেই কিছু না কিছু আছেঃ কিছু স্থানীয়, কিছু ইউরোপীয়, কিছু প্রাচীন আবার কিছু আধুনিক। এ সমস্ত কিছু মিলিয়ে এমন একটা কাঠামোবিহীন উদ্দেশ্যহীন ধাঁধাঁ তৈরি হচ্ছে যার পরিণামে একটি কাঠামোবিহীন উদ্দেশ্যহীন সমাজও তৈরি হচ্ছে। এ সমাজগুলো হলো নন-ইউরোপীয় সমাজ যারা গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য থেকে সভ্যতার নামে তাদের কাঠামো আমদানী করেছে।

নন-ইউরোপীয় দেশসমূহে বিশেষ কাঠামো ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবিহীন মোজাইক সভ্যতার এই যে উত্থান তার গোড়া কোথায়? ইউরোপে সপ্তাদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে পুঁজিপতি ও ধনীদের হাত ধরে যন্ত্রের উদ্ভব ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যন্ত্রের বৈশিষ্ট হলো কার্যকর অবস্থায় এটি সবসময় ক্রমবর্ধমান উৎপাদন দাবি করে। এটি হলো যন্ত্রের বলপূর্বক শাসন। ফলে উৎপাদিত পণ্যের অযাচিত মজুদ এড়ানোর লক্ষ্যে বর্ধিত হারে ভোগের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু মানুষের ভোগের পরিমাণ উৎপাদনের মতো একই হারে বৃদ্ধি পায় না। তাহলে এই অতিরিক্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত নিয়ে কী করা যেতে পারে? ভোগের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টিই এর একমাত্র সমাধান।

ইউরোপের দেশগুলোর জনসংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৪০ থেকে ৬০ মিলিয়নের বেশী হবে না। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের হার মানুষের

ভোগের আকাঙ্খার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে। এভাবে যেহেতু যন্ত্র বলপূর্বকভাবে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করে তাকে জাতীয় সীমানার বাইরে পা রাখতে হয়। ফলে উদ্বৃত্ত পণ্যসমূহ আফ্রিকা ও এশিয়াতে পাড়ি জমায়। এই পণ্যসমূহ কি সত্যিকারভাবে প্রাচ্যে নেওয়া সম্ভব যেখানে মানুষের জীবনাচার ও জীবনকাঠামোতে এই পণ্যগুলোর কোন দরকারই নেই? পণ্যসমূহের ভোগ কি চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব? অসম্ভব! এশিয়ার সমাজে দেখা যায় একজন এশীয়ের পোষাক তার স্ত্রী কর্তৃক অথবা স্থানীয় কোন জায়গায় বানানো হয়। তারা ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরিধান করে। এখানে যন্ত্র নির্মিত কারখানার পণ্য অথবা হাই ফ্যাশনের পোষাক কিংবা ইউরোপের আধুনিক ফ্যাব্রিক্সের কোন চাহিদা-ই নেই।

একজন আফ্রিকান অথবা এশীয় নারীর নিজের সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিধানের জন্য ইউরোপীয় কসমেটিকস কিংবা অলংকারের কোন প্রয়োজনই ছিল না। তার নিজস্ব কসমেটিকস, নিজস্ব সামগ্রী এবং নিজস্ব সাজ-সামগ্রী আগে থেকেই বিরাজমান ছিল। সে এগুলোই ব্যবহার করতো এবং সবাই এগুলোরই প্রশংসা করতো। কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করতো না।

তার এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে পুঁজিবাদী পণ্য সামগ্রী অবিক্রীতই থেকে গেলো। এই চিন্তা-প্রক্রিয়ার জনগণ, যাদের স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা ও রুচি রয়েছে, যাদের নিজস্ব জীবন-পদ্ধতি রয়েছে এবং যারা নিজস্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরাই উৎপাদন করে তারা ১৮ শতকের পুঁজিপতিদের উৎপাদিত পণ্য ভোগ করার মতো লোক ছিলো না। তাহলে কি করা যেতে পারে? সমস্যাটা ছিলো এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণকে ইউরোপীয় পণ্যের ভোক্তা বানানো নিয়ে। তাদের সমাজকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে তারা ইউরোপীয় পণ্য ক্রয় করে। এর অর্থ দাঁড়ালো আক্ষরিকভাবেই একটি জাতিকে পরিবর্তন করা। তাদের একটি জাতিকে পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং একজন মানুষের পোষাক, তার ভোগের ধরন, তার অলংকার, তার বাসগৃহ এবং তার শহর পরিবর্তনের জন্য তাদের একজন মানুষকে আপাদমস্তক রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়।

তার কোন অংশটির পরিবর্তন সবার আগে করা দরকার? তার নীতি ও চিন্তা-প্রক্রিয়া। আলোকিত ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের উপর কাজ বর্তায় এমন একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করা যার মাধ্যমে নন-ইউরোপীয় জনগণের মনন, রুচি ও জীবন-পদ্ধতি পাল্টে দেওয়া যায়। প্রজেক্টটি ছিলো অনেকটা এরকমঃ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমজাতীয় হতে হবে; তাদের জীবন-ধারণ হবে একই রকমের, তাদের চিন্তা-পদ্ধতি হবে একই রকমের।

একজন মানুষ ও একটি জাতির ব্যক্তিত্ব ও চেতনার নির্মানে কোন উপাদানগুলো ভূমিকা রাখে? ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি, অতীত সভ্যতা, শিক্ষা এবং ঐতিহ্য এগুলোই হলো একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চেতনা এবং সাধারণভাবে একটি জাতির চরিত্র নির্মানের গাঠনিক উপাদান। এই উপাদানগুলো সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। তারা ইউরোপে একভাবে হাজির হয় আবার এশিয়া ও আফ্রিকাতে ভিন্নভাবে হাজির হয়। তাদের সবাইকে একই রকম হতে হবে। মানুষকে সমজাতীয় করতে হলে চিন্তা ও চেতনার যে ভিন্নতা তা ধ্বংস করতে হবে। তারা যেখানেই থাকুক না কেন একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ীই তাদের চলতে হবে।

এই কাঠামোটি কি? এটি ইউরোপের বাতলে দেওয়া কাঠামো। এটি দেখায় কিভাবে সমগ্র এশীয় জাতিগোষ্ঠীকে এবং আফ্রিকানদের চিন্তা করতে হবে, কিভাবে পোশাক পরিধান করতে হবে, কিভাবে আকাংখা পোষণ করতে হবে, কিভাবে দুঃখ করতে হবে, কিভাবে তাদের গৃহ নির্মাণ করতে হবে, কিভাবে তাদের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিভাবে ভোগ করতে হবে, কিভাবে তাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে হবে এবং সর্বশেষ কিভাবে পছন্দ করতে হবে ও কি পছন্দ করতে হবে? শীঘ্রই এটি প্রতিয়মান হয় যে আধুনিকায়ন বলে একটি নয়া সংস্কৃতি পৃথিবীতে হাজির হয়েছে।

ইউরোপীয়রা বুঝতে পারে প্রাচ্যের একজন অধিবাসীকে আধুনিকায়নের অমোঘ আকাঙ্খা দ্বারা প্রলুব্ধ করার মাধ্যমেই তার নিজস্ব অতীতকে অস্বীকার করানো যেতে পারে। তখনই সে নিজ হাতে তার স্বতন্ত্র সংস্কৃতির গাঠনিক উপাদান সমূহ, তার ধর্ম ও ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করতে সাহায্য করবে। ফলে আধুনিকায়নের এ প্ররোচণা ও আকাঙ্খা দূর-প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, নিকট প্রাচ্য, ইসলামী ও ব্ল্যাক দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে এবং আধুনিকায়িত হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় একজন ইউরোপীয়র মতো হয়ে উঠা।

> সরাসরি বলতে গেলে আধুনিকায়িত হওয়ার অর্থ হলো ভোগের ক্ষেত্রে আধুনিকায়িত হওয়া। একজন ব্যক্তির আধুনিকায়িত হয়ে উঠার অর্থ হলো তার চাহিদা পূরণের জন্য তার রুচি আধুনিক বস্তুসামগ্রী আকাঙ্খা করে। অন্যভাবে বলতে গেলে সে ইউরোপ হতে নতুন জীবন-প্রণালী ও আধুনিক পণ্য আমদানি করে এবং তার নিজস্ব স্বতন্ত্র ও জাতীয় অতীত থেকে উৎসারিত নতুন ধরনের পণ্য ও জীবন-প্রণালী গ্রহণ করে না। নন-ইউরোপীয়দের আধুনিকায়িত করা হয় ভোগের খাতিরে। অবশ্য পশ্চিমারা প্রতিরোধ ও জাগরণের ভয়ে এ কথা বলতে পারে না যে, তারা তাদের (প্রাচ্যবাসীর) বুদ্ধি, মনন ও ব্যক্তিত্বকে পুনর্গঠন করছে।

ফলে ভোগের নতুন এই রুপরেখা চাপিয়ে দিতে ইউরোপীয়দের নন-ইউরোপীদেরকে এটা ভাবাতে হয় যে আধুনিকায়ন ও সভ্যতা সমার্থক। কেননা সভ্যতার প্রতি সবারই একটা আকাঙ্খা থাকে। “আধুনিকায়ন”কে ‘সভ্যতা’ আকারে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এভাবে জনগণ আধুনিকীকরণের ইউরোপীয় পরিকল্পনায় সাহায্য করে। যেহেতু নন-ইউরোপীয়রা নতুন পণ্য উৎপাদন করতে পারে না, তারা স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যা তাদের জন্য পণ্য উৎপাদন করে এবং যাই উৎপাদন করা হোক না কেন তা-ই তারা কিনবে এই আশা ধারণ করে।

আধুনিকায়ন ঐতিহ্য, ভোগের ধরণ ও বস্তুগত জীবনকে পুরাতন থেকে নতুনের দিকে পরিবর্তন করছে। সমস্ত নন-ইউরোপীয়দের আধুনিকায়িত করার জন্য সর্বপ্রথম তাদেরকে ধর্মের প্রভাব অতিক্রম করতে হয়। কেননা ধর্ম যেকোন সমাজে একটি স্বাতন্ত্রবোধের জন্ম দেয়। ধর্ম একটি উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার্য ধরে নেয় যার সাথে সবাই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ঐক্য অনুভব করতে পারে। যদি এই বুদ্ধিবৃত্তির বিনাশ সাধন করা যায় এবং এর অবমাননা করা যায় তবে এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিও অপমানিত হয় এবং ধ্বংসের অনুভূতি তারিত হয়। ফলে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা “ধর্মীয় উন্মত্ততা” (Fanaticism)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ফ্রাঞ্জ ফানো যেমনটি বলেছেন, “ইউরোপ নন-ইউরোপীয়দের যন্ত্র দ্বারা বন্দী করতে চেয়েছিলো। একজন ব্যক্তি কিংবা কোন সমাজকে কি যন্ত্র অথবা নির্দিষ্ট কিছু ইউরোপীয় পণ্য দ্বারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা সম্ভব যদি তার কাছ থেকে তার ব্যক্তিত্বকে ছিনিয়ে নেওয়া না হয়?” না। সম্ভব না। অবশ্যই সর্বপ্রথম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করতে হবে।

তারা তাকে তার ব্যক্তিত্ব হতে বঞ্চিত করে। নিজের ভিতর যতোগুলো ‘আমি’ সে অনুভব করে সবগুলো থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তাকে অধিকতর বিনম্র সভ্যতা ও সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে নিজেকে ভাবতে বাধ্য করতে হবে। এটিও স্বীকার করতে বাধ্য করতে হবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতা, পশ্চিমা সভ্যতা এবং পশ্চিমা জাতি শ্রেষ্ঠতর। আফ্রিকাকে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, একজন আফ্রিকান হলো বর্বর বা অসভ্য যাতে সে ‘সভ্য’ হওয়ার জন্য প্ররোচিত হয় এবং নিজেকে ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দেয় যারা তার ভ্যগ্য নির্ধারণ করবে। বেচারা বুঝতে পারে না যে, সে সভ্য হওয়ার স্থলে আধুনিকায়িত হচ্ছে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই হঠাৎ করেই আঠারো এবং উনিশ শতকে আফ্রিকানদের বর্বর, অসভ্য ও নরখাদক হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। শতশত বছর ধরে ইসলামী সভ্যতার সাথে লেনদেন করা আফ্রিকানরা কখনোই নরখাদক হিসেবে পরিচিত ছিল না। হঠাৎ করেই একজন কালো আফ্রিকান নরখাদক হয়ে গেলে। তার গায়ে বিশেষ গন্ধ, বিশেষ জাতির রঙ লাগানো হলো। বলা হলো তার মস্তিস্কের ধূসর অংশটি কাজ করে না এবং সামনের অংশটি একজন এশীয়ের মতোই পশ্চিমাদের তুলনায় খাটো।

তারপর আমরা দেখতে পেলাম “পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্ব” এবং এর “সভ্যতা ও জনগণের শ্রেষ্ঠত্বে”র উপর ভিত্তি করে একটি নয়া সংস্কৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। তারা আমাদের এবং পুরো বিশ্বকে বুঝালো যে ইউরোপীয়রা মানসিকভাবে ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসাধারণভাবে মেধাবী যেখানে প্রাচ্যীয় জনগণ হলো অদ্ভুত আবেগ ও নস্টিক (gnostic) মেধার অধিকারী আর নিগ্রোদের দৌড় কেবল নাচ, গান, ছবি আঁকা আর ভাস্কর্য নির্মাণ পর্যন্তই। এরপর নন-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর আধুনিকীকরনের বৈধতা প্রদানের জন্য জন্ম নেয়া এই চিন্তা-প্রক্রিয়াটিই নন-ইউরোপীয় এলিট শ্রেনীদের চিন্তা-কাঠামোর ভিত্তিতে পরিণত হলো। আধুনিকায়ন কিসের? ভোগের, মননের নয়। সভ্যতার নামে আধুনিকায়নের প্রচারণা চলতে থাকে এবং ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নন-ইউরোপীয় সমাজগুলো নিজেরাই তাদের মেধাবী বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে আধুনিকায়িত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে উঠে পরে লাগলো।

এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উৎপত্তি ও গঠন বিবেচনা করা যাক। জ্যাঁ পল সার্ত্রে “The Wretched of the Earth” গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, “আমরা আফ্রিকান অথবা এশীয় যুবকদের একটি দলকে আমস্টারডাম, প্যারিস, লন্ডনে নিয়ে আসবো... কিছু মাস তাদেরকে এদিক সেদিক ঘুরতে নেওয়া হবে, তাদের পোশাক ও অলংকার পাল্টানো হবে, তাদেরকে আদব-কায়দা, সামাজিক রীতি এবং কিছুটা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে। সংক্ষেপে, তাদেরকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধমুক্ত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। তারা আর ঐ ব্যক্তি থাকবে না যে নিজের মনের কথা বলতে পারে; বরঞ্চ তারা আমাদের মুখপাত্র হয়ে উঠবে। আমরা চিৎকার দিয়ে মানবতা ও সাম্যের স্লোগান ধরবো আর তারা আফ্রিকায় আমাদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে “মানবতা” “সাম্য” এসবের গান গাইবে।

এরা হলো সেইসব ব্যক্তি যারা তাদের জনগণকে নিজেদের ধর্মনিষ্ঠা পাশে সরিয়ে রাখতে, ধর্ম পরিত্যাগ করতে এবং স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে প্রলুব্ধ করেছিলো। কেননা তাদের ধারণা ছিলো এগুলো তাদেরকে আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ থেকে পিছিয়ে রেখেছিলো। তারাই তাদের জনগণকে প্ররোচিত করেছিলো আপাদমস্তক পশ্চিমা হওয়ার জন্য।

রপ্তানি ও বিনিময়ের মাধ্যমে কীভাবে ইউরোপীয় হওয়া সম্ভব? সভ্যতা কি এমন কোন পণ্য যা রপ্তানি করা যায়? অবশ্যই না। কিন্তু আধুনিকতা হলো আধুনিক পণ্যের একটি সমষ্টি যা কোন সমাজ ১, ২ অথবা ৫ বছরের মধ্যেই আমদানি করতে পারে। একটি

নির্দিষ্ট সমাজকে কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে আধুনিকায়িত করা সম্ভব। একইভাবে একজন ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণরূপে আধুনিকায়িত করা সম্ভব। এমনকি একজন ইউরোপীয়র চাইতেও বেশী আধুনিক করা সম্ভব। তার ভোগের ধরন পরিবর্তন করলেই সে আধুনিকায়িত হয়ে উঠবে। ঠিক এটাই ইউরোপীয়রা আশা করেছিল।

কিন্তু একটি জাতি অথবা সমাজকে সভ্য করা এতো সহজ নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন ইউরোপীয় নির্মিত পণ্য নয় যে তার মালিকানাই কাউকে সভ্য বানিয়ে দেবে। কিন্তু তারা আমাদের বিশ্বাস করালো যে আধুনিকায়নের নামে এইসব ছাইপাশ হলো সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ এবং আমরাও আগ্রহের সাথে আমাদের যা কিছু ছিলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। এমনকি আমাদের সামাজিক মর্যাদা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও ত্যাগ করলাম, কেবলমাত্র আমাদের মুখে ইউরোপের দেওয়া ফোঁটা ফোঁটা পানির তৃষ্ণার্ত চোষক হওয়ার জন্য।

> এটাই হলো আধুনিকতার প্রকৃত অর্থ। এভাবেই কোন ধরনের প্রেক্ষাপটবিহীন একটা সত্তা নির্মিত হলো যে তার ইতিহাস ও ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন; সে তার জাতি, তার ইতিহাস ও তার পূর্বপুরুষরা এই পৃথিবীতে যা কিছু নির্মান করেছে তার ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ। সে তার নিজস্ব মানবিক গুনাবলি হতে বিচ্ছিন্ন; সে কেবলমাত্র একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড ব্যক্তিত্ব যার ভোগের ধরন পালটে দেওয়া হয়েছে। যার মনন পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে; যে তার পুরনো মূল্যবান চিন্তা, সমৃদ্ধ অতীত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ভেতর থেকে সম্পূর্ণরূপে শুন্য হয়ে গেছে। জ্যাঁ পল সার্ত্রে এভাবে বলেছেন, "এই সমাজগুলোতে একজন অনুকারক (assimilate) (অর্থাৎ একজন আধা-চিন্তাবিদ (Quasi thinker) ও আধা-শিক্ষিত (quasi-educated)) সৃষ্টি করা হয়, কোন প্রকৃত চিন্তক কিংবা বুদ্ধিজীবী নয়।"

একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হলেন তিনি যিনি তার সমাজকে জানেন, এর সমস্যা সম্পর্কে সচেতন, তার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন, এর অতীত সম্পর্কে জানেন, এবং যিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারেন। এই আধা-বুদ্ধিজীবীগণ অবশ্য জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইউরোপ এবং আমেরিকাতে জ্যাজ গাওয়া হচ্ছে এমন জায়গায় গিয়ে গান পছন্দ না হলে তারা স্পষ্টভাবে সরাসরি তা বলে দেয়। কিন্তু প্রাচ্যীয় দেশগুলোতে কেউ একথা বলার সাহস রাখে না যে, "জ্যাজ খারাপ" এবং আমি জ্যাজ পছন্দ করি না"। কেন? কারণ তারা তার মধ্যে এতোটুকু ব্যক্তিত্ব অবশিষ্ট রাখেনি যার ভিত্তিতে সে তার পোশাকের রং কিংবা খাবারের স্বাদ বাছাই করবে। ফলে ফ্রাঞ্জ ফানো যেমনটি বলেছেন, "প্রাচ্যের দেশগুলো যাতে ইউরোপকে অনুকরণ করে এবং বানরের মতো তাকে অনুকরণ করে সে লক্ষ্যে তাদের নন-ইউরোপীয়দের কাছে প্রমাণ করতে হতো যে তারা ইউরোপীয়দের মতো একই মানবিক মূল্য ধারন করে না। তাদের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম এবং শিল্প এ সমস্ত কিছুকে খাটো করার দরকার ছিলো যাতে করে তারা এ বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমরা দেখি যে, ইউরোপীয়রা ঠিক তাই করেছে।"

তারা এমন একটি জনগোষ্ঠী তৈরী করে যারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতো না কিন্তু তারপরও একে ঘৃণা করার জন্য ছিলো সদা প্রস্তুত। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে বাজে কথা বলে বেড়ায়। তারা নিজেদের ইতিহাস বুঝে না কিন্তু এর নিন্দা করার জন্য এক পায়ে খাড়া। অন্যদিকে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া যা-ই ইউরোপ থেকে আমদানি করা হয় না কেন তারা তার প্রশংসায় মেতে উঠে। ফলত এমন একটি সত্ত্বার জন্ম হলো যে প্রথমে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তারপর এগুলোকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে শুরু করে। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, সে একজন ইউরোপীয় হতে নিম্নতর। যখন এই বিশ্বাস তার ভেতরে শেকড় গাড়তে শুরু করে সে নিজেকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে। তার সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত কিছুর সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে যে কোন উপায়ে নিজেকে একজন ইউরোপীয়র মতো বানাতে যাকে অবজ্ঞা করা হয় না এবং খাটো করে দেখা হয় না। যে অন্তত বলতে পারে, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি নিজেকে একজন ইউরোপীয়র পর্যায়ে পৌঁছার মতো আধুনিক করতে পেরেছি।"

এবং একজন নন-ইউরোপীয় যখন নিজেকে আধুনিকায়িত করার সুখ-বিলাস করতে থাকে ইউরোপীয় পুঁজিপতি ও বুর্জোয়ারা তাকে নিজেদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ভোক্তায় রূপান্তরের সাফল্যে হাসতে থাকে।

উৎসঃ shariati.com

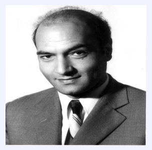

আলী শরীয়তি

দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। ইরান বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপকার।